তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে নতুন বিতর্ক ও নাগরিক ভাবনা

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৩ অক্টোবর, ২০০৯)

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে একটি নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ক্ষমতাসীন সরকার এ ব্যবস্থাকে বাতিল করার পক্ষে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও গ্রহণ করা শুরু করেছে। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা এ প্রস্তুতির অংশ। বিরোধী দল অবশ্য এ ব্যাপারে ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিলুপ্তির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ নিয়ে সারা দেশে একটি তুমুল বিতর্ক হওয়া আবশ্যক। একটি জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে এ ব্যবস্থাটি প্রচলিত হয়, তাই এর বিলুপ্তির জন্যও আরেকটি জাতীয় ঐক্যমত্য আবশ্যক। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে নাগরিক হিসেবে আমাদের ভাবনা তুলে ধরাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

নব্বইয়ের এরশাদ বিরোধী গণআন্দোলনের সময়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে তিন জোটের 'যুক্ত ঘোষণা'য় প্রথমবারের মতো একটি *অন্তবর্তীকালীন সরকার* গঠনের দাবি ওঠে। এ দাবির প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে ১৯৯০ সালে এমন একটি সরকার গঠিত হয়। একটি নির্দলীয় *তত্ত্বাবধায়ক সরকারের* দাবি জোরালোভাবে ওঠে ১৯৯৪ সালের মাগুরার উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের কারচুপি এবং তা ঠেকাতে নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীসহ বিরোধী দলসমূহের তুমুল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের একতরফা নির্বাচনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি 'নির্বাচিত' সরকার তার মেয়াদ শেষে একজন প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে একটি 'অনির্বাচিত' উপদেষ্টা পরিষদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিধান করা হয়, যা গণতান্ত্রিক চেতনা ও সংস্কৃতির সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। এছাড়াও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রাজনৈতিক দলগুলোর একে অপরের ওপর অনাস্থারাই প্রতিফলন, কার্যকর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে যা কোনোভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উপরন্তু এ ব্যবস্থার ফলে রাজনৈতিক দলগুলো 'দায়িত্বহীন' আচরণে উৎসাহিত হয় এ ধারণা থেকে যে, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব – তাদের নয়। নিজেদের পছন্দের ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা করার লক্ষ্যে জোট সরকারের আমলে বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বৃদ্ধি, দলের প্রতি অনুগত ব্যক্তিদেরকে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদান ইত্যাদি এমন আচরণেরই প্রতিফলন। সর্বোপরি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে উচ্চ আদালত দলীয় রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, যা বিচার বিভাগের বিশ্বাসযোগ্যতা চরমভাবে ক্ষুন্ন করেছে। এ সকল কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আমাদের গণতান্ত্রিক অবকাঠামো ও সংস্কৃতিতে গুরুতর ক্ষতিসাধন করেছে। তাই রাষ্ট্রে একটি সত্যিকারের কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তির কোনো বিকল্প নেই। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হলে মেয়াদোত্তীর্ণ বিদায়ী সরকারকেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব পালন এবং নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর *দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তাভাবনা* (আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫) গ্রন্থে তিন টার্মের পর এর বিলুপ্তির কথা বলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন, 'আমরা আগামী তিনটি নির্বাচন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে চেয়েছি, যাতে করে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত ত্রুটি রয়েছে ধীরে ধীরে তা সংস্কার ও ত্রুটিমুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থায় নিয়ে আসতে পারি।' অর্থাৎ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের পর তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিলুপ্তির কথা বলেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ সকল সংস্কার এখনো হয় নি এবং অতীতের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে অদূর ভবিষ্যতে হবে বলেও আস্থা রাখা দুরূহ।

নব্বইয়ের তিন জোটের 'যুক্ত ঘোষণা'য় স্বাক্ষরকারী দলগুলোর মধ্যেও আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তাদের দাবি করা অন্তবর্তীকালীন সরকার হবে একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। এ লক্ষ্যে তারা তাদের যুক্ত ঘোষণায় নির্বাচিত সরকারের পক্ষে কতগুলো সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। জনগণের ভোটে একটি নির্বাচিত জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠা করা, সংসদের কাছে প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, বিচারবিভাগ স্বাধীন করা, জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা, মৌলিক অধিকার পরিপন্থি সকল আইন বাতিল করা, অসংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা দখলের সব প্রচেষ্টা প্রতিহত করা এবং নির্বাচন ব্যতীত কোনো সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় বা অন্য কোনো অজুহাতে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত না করা ছিল তাদের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার। দুর্ভাগ্যবশত, ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি সরকার রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন ব্যতীত যুক্ত ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত অঙ্গীকারগুলোর কোনোটিই বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। বস্তুত পরবর্তী কোনো সরকারই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে নি। অর্থাৎ আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সংস্কার সম্পর্কিত নব্বইয়ের অঙ্গীকারগুলো নগ্নভাবে বরখেলাপ করেছে।

নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। কমিশনের অধীনে রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন এবং অসদাচারণের অভিযোগ, তদন্ত সাপেক্ষে, প্রার্থীতা ও নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা কমিশনকে প্রদান ছিল যার অন্যতম। একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে কমিশনকে এ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাজনৈতিক দলগুলোর চাপে রাষ্ট্রপতি আরেকটি অধ্যাদেশ জারি করে ২০০১ সালের নির্বাচনের আগেই সংস্কারের এ সকল বিধানকে রহিত করেন। এভাবে আবারো নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতায়িত করা তথা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের সুযোগ নষ্ট করা হয়।

নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করাসহ একটি বলিষ্ঠ সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের আরেকটি অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির প্রভাবে এবং এর বিহীতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে পরবর্তীতে আমাদের পুরো নির্বাচনী ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়ে, যার প্রেক্ষাপটে জারি হয় জরুরি অবস্থা এবং সৃষ্টি হয় প্রায় দু'বছরের আরেকটি অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এই সরকারের আমলে, এমনকি তার আগ থেকেই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত ১৪ দলীয় জোট নির্বাচন প্রক্রিয়া, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দলের সংস্কার ও ভোটারদের প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার দাবি করে আসছিল। মাননীয় শেখ হাসিনা ১৫ জুলাই, ২০০৫ তারিখে একটি সংবাদ সম্মেলনে জোটের পক্ষ থেকে সংস্কার প্রস্তাবগুলো প্রথম জাতির সামনে তুলে ধরেন। পরবর্তীতে ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত মহাজোটের মহাসমাবেশে ২৩ দফা 'অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি' প্রকাশের মাধ্যমে এ সকল সংস্কার প্রস্তাবের প্রতি পুনঃসমর্থন ব্যক্ত করা হয়। বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা এ সকল প্রস্তাব জাতীয় সংসদেও উত্থাপন করেন।

পরবর্তীতে পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ২০০৭ সালের শেষ দিকে অনেকগুলো মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও স্বাধীন করা, নির্বাচনী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সংস্কারের ব্যাপারে এ সকল মতবিনিময় সভায় কতগুলো ঐক্যমত্যও সৃষ্টি হয়। আরো ঐক্যমত্য সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক দলের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের। দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা, দলের প্রত্যেক স্তরের কমিটিতে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন বিলুপ্তিকরণ, দলের তৃণমূলের কমিটিগুলোর সুপারিশের প্রেক্ষিতে দলের মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি শর্তসাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনের অধীনে রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন এ সকল সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। রাজনৈতিক দলগুলো এ সকল শর্ত অমান্য করলে নির্বাচন কমিশনকে নিবন্ধন বাতিলের ক্ষমতা প্রদানের ব্যাপারেও ঐক্যমত্য সৃষ্টি হয়। এর পর সংস্কার প্রস্তাবগুলো একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার অধীনে ২৯ ডিসেম্বরের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নির্বাচিত সরকারের আমলে নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনে অধ্যাদেশটি অনুমোদনকালে এতে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়। নিবন্ধনের উপরিউক্ত শর্তগুলো না মানলে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন বাতিলের ক্ষমতা রহিতকরণ ছিল যার অন্যতম। অর্থাৎ এ পরিবর্তনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে একটি সাক্ষী গোপাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, রাজনৈতিক দলগুলো নিবন্ধনের শর্ত মেনে না চললে কিংবা যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হলে ক্ষমতাহীন কমিশনের কিছুই করার থাকবে না। এছাড়াও ক্ষমতাসীন জোটের অন্যতম শরিক আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি তাদের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে নিবন্ধনের শর্তগুলোকে প্রায় পুরোপুরি উপেক্ষা করেছে। অর্থাৎ আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো নব্বইয়ের পর আবারো তাদের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো। নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতায়িত করে শক্তিশালী করার পরিবর্তে আরো দুর্বল করা হলো। তাই রাজনৈতিক দলগুলো আসলেই সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগ্রহী কি না তা নিয়ে নাগরিকদের মনে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ অতীতে অঙ্গীকার ভঙ্গ করলেও এখন আবার সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতায়িত করার কথা বলছে। কিন্তু সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় (necessary), কিন্তু যথেষ্ট (sufficient) নয়। আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন: (ক) ক্ষমতাসীন সরকারের ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রশ্নাতীত নিরপেক্ষতা; (খ) রাজনৈতিক দলের সদাচারণ; (গ) নাগরিক সচেতনতা ও নাগরিক সমাজের সোচ্চার ভূমিকা। (ঘ) প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন, (ঙ) যথাযথ আইনি কাঠামো, (চ) নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, পক্ষপাতহীন আচরণ ও দক্ষতা ইত্যাদি।

অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও শক্তিশালী হলেই হবে না, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আরো অনেকগুলো উপাদান আবশ্যক। প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা ও সহযোগিতা যার অন্যতম। সারা দেশে একইদিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রায় ১০ লক্ষ ব্যক্তির সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। সরকারি সহযোগিতা ছাড়া এতো বিরাট জনবল সংগঠিত করা নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সম্ভব নয় – এতো লোকবল কমিশনের পক্ষে নিয়োগ প্রদান অসম্ভব। আর এ বিরাট সহায়ক শক্তির নিরপেক্ষতা নির্ভর করবে ক্ষমতাসীন সরকারের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলো থেকে এ বিষয়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। সকল পর্যবেক্ষকদের মতে ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ হলেও, নির্বাচিত দলীয় সরকারের অধীনে ২২ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচন ছিল সমস্যাশঙ্কুল। যে সকল কর্মকর্তারা জাতীয় নির্বাচনে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলেন, তারাই উপজেলা নির্বাচনকালে নিরপেক্ষ আচরণ করেন নি বা করতে পারেন নি। এছাড়াও অনিয়মের তদন্তকালে তারা নিরপেক্ষভাবে সাক্ষ্য প্রদানও করতে পারেন নি।

উপরন্তু নির্বাচনকালে কোনোরূপ অন্যায় বা অনিয়ম লক্ষ করলে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারে। কিন্তু এই নির্দেশ পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালনের জন্য সরকারের আন্তরিকতা আবশ্যক। আবশ্যক প্রশাসনিক পদক্ষেপ। কর্মকর্তারা নির্দেশ অমান্য করলে বাস্তবে কমিশনের তেমন কিছুই করার থাকে না।

রাজনৈতিক দলের সদাচারণ ছাড়াও সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দল ছলে-বলে-কলে-কৌশলে নির্বাচনে জিততে বদ্ধপরিকর হলে এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও টাকার খেলায় লিপ্ত হলে পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন ও সবচেয়ে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের পক্ষেও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না। বস্তুত রাজনৈতিক দলের অসদাচারণের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবেলা করতেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সৃষ্টি। এছাড়া সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেরও সহযোগিতা। উদাহরণস্বরূপ, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২০ জন প্রার্থীর ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত কমিশনের সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে দেয়। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ঋণখেলাপী কিংবা অন্যান্য অযোগ্যতার কারণে কমিশন কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাতিল করা হলেও, এদের অনেকে আদালতের হস্তক্ষেপের ফলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান এবং বিজয়ীও হন।

এছাড়াও নির্বাচন কমিশন একটি বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত দ্বীপে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে না। কমিশনের কার্যক্রম পারিপার্শ্বিকতা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর – যেমন, উচ্চ আদালত – নিরপেক্ষ না হলে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারলে, কমিশনের পক্ষে এককভাবে স্বাধীনতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। ফলে একটি সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে না উঠলে কমিশনের পক্ষে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করা আকাশকুসুম কল্পনা বই কিছু নয়।

তর্কের খাতিরে আমরা যদি ধরেও নেই যে, একটি স্বাধীন এবং শক্তিশালী কমিশন এককভাবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করতে পারবে, কিন্তু সে নির্বাচনী ফলাফল রাজনৈতিক দলসমূহের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে তা কোনোভাবেই নিশ্চিত করে বলা যায় না। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরাজিত দল সবসময়ই কারচুপির অভিযোগ তুলেছে এবং অনেকক্ষেত্রে ফলাফল প্রত্যাখ্যানও করেছে। একটি জাতীয় ঐক্যমত্য ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করলে নির্বাচনী ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ভবিষ্যতে আরো নতুন জটিলতার সৃষ্টি হতে বাধ্য।

পরিশেষে, এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই এর বিলুপ্তি অপরিহার্য। তবে তা করার পূর্বে নির্বাচন কমিশনকে সত্যিকারার্থেই স্বাধীন ও শক্তিশালী করা জরুরি। কিন্তু এ আবশ্যকীয় কাজটিই যথেষ্ট নয়। কারণ রাজনৈতিক দল সদাচারণ না করলে এবং ক্ষমতাসীন সরকার পরিপূর্ণভাবে সহায়তা না করলে সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের পক্ষেও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর নয়। গত জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনে আমরা এর আলামত কিছুটা দেখেছি। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তির আগে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতায়িত ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রয়োজন রাজনৈতিক দলের ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংস্কার। প্রয়োজন আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন। আরো প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা।

'সুজন' এর পক্ষ থেকে ২০০৪-এ ঘোষিত সংস্কার প্রস্তাবে আমরা দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বিলুপ্তকরণের দাবি করেছিলাম। আমরা আশা করি যে, এ সময়ের মধ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করার লক্ষে – যাতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকারিতা অর্জন করে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তন আসে – যথাযথ সংস্কার উদ্যোগ করা হবে। তবে সংস্কার ধারণাগুলোকে আরো শাণিত করার এবং এ ব্যাপারে একটি জাতীয় ঐক্যমত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে এই মুহূর্তেই দেশব্যাপী একটি তুমুল বিতর্ক শুরু হওয়া আবশ্যক। এ লক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে, বিশেষত আমাদের চিন্তাশীল নাগরিকদেরকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

প্রসঙ্গত, অনেকের ধারণা যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান না থাকলে, ১১ জানুয়ারি, ২০০৭ এ বাংলাদেশে সামরিক আইন জারি হতো, যা কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। অনেকে আরো ধারণা করেন যে, একটি জাতীয় ঐক্যমত্য ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করলে এই ইস্যুতে নির্বাচন বয়কটের আশঙ্কাও থেকে যায়। ফলে আমাদের পুরো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ভবিষ্যতে বড় ধরনের ঝুঁকির সম্মুখিন হবে।